দৈনিক খবর

০৮ 082 তারিখ OCT 1988 পৃষ্ঠা 5 কলাম 3

এপিঠ ওপিঠ

সমদর্শী

দেশের ৪টি শিক্ষা বোর্ডের পরীক্ষা পদ্ধতিকে নতুন করে সাজানো হয়েছে বলে দৈনিক খবরের এক সংবাদে উল্লেখ করা হয়েছে। প্রকাশ, নতুন নিয়ম অনুসারে এখন থেকে নবম শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীরা প্রতি বছর ৩০শে জুনের পর টিসি অর্থাৎ ট্রান্সফার সার্টিফিকেট নিতে পারবে না। রেজিস্ট্রেশন করার পর এই শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীরা স্কুল থেকে অন্য স্কুলে বদলীও হতে পারবে না। এ ছাড়া ট্রান্সফার সার্টিফিকেট এনে নতুন কোন ছাত্র-ছাত্রী স্কুলে ভর্তির সুযোগ পাবে না। জানা গেছে, উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার ক্ষেত্রেও একই নিয়ম প্রযোজ্য হবে। বছরের ৩১শে আগস্টের পর কোন ছাত্র-ছাত্রী একাদশ শ্রেণীতে ভর্তি হতে পারবে না। তাছাড়া কোন ছাত্র-ছাত্রী ট্রান্সফার সার্টিফিকেট নিয়ে কলেজ থেকে বদলী অথবা অন্য কলেজে ভর্তি হতে পারবে না।

খবরটি আমার কাছে একটু গোলমেলেই মনে হচ্ছে। কারণ, উক্ত খবরে পরীক্ষা পদ্ধতি নতুন করে সাজানোর কথা বলা হলেও 'নতুনের' কোন গন্ধ খুঁজে পাইনি। পরীক্ষা পদ্ধতি নতুন করে সাজানোর ব্যাপার নিঃসন্দেহে এক বিপ্লবী সিদ্ধান্ত। কিন্তু খবর পড়ে মনে হলো না সে রকম কিছু হয়েছে। তবে হ্যাঁ, সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের তরফ থেকে যে সমস্ত সিদ্ধান্ত বা নির্দেশ ৪টি বোর্ডে পাঠানো হয়েছে সেগুলো কঠোরভাবে মেনে চলা হলে পরীক্ষায় নকল বা অসদুপায় অবলম্বনের মাত্রা কিছুটা হ্রাস পাবে এটা বলা যায়। তাই আমরা বলতে পারি পরীক্ষা পদ্ধতি নতুন করে সাজানো নয়, বরং পরীক্ষায় অসদুপায় বন্ধ করার প্রয়াস হিসেবেই কর্তৃপক্ষ উপরোক্ত ব্যবস্থা বা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন।

তাছাড়া পরীক্ষা পদ্ধতি ঢেলে সাজাবার মত মৌলিক কোন সিদ্ধান্ত সরকার কর্তৃক গৃহীত হলে অবশ্যই তা কাগজে আসতো। সরকারের তরফ থেকে এ ব্যাপারে অবশ্য আগেই বার কয়েক আভাস দেয়া হয়েছিলো। বলা হয়েছিলো পরীক্ষা পদ্ধতি ঢেলে সাজানোর কথা। কিন্তু বিষয়টি এতই জটিল যে, হুট করে সে রকম কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা সম্ভব নয়। বিভিন্ন দেশের শিক্ষা ব্যবস্থার তুলনামূলক আলোচনা, শিক্ষাবিদদের পরামর্শ, অভিজ্ঞজনদের দিক-নির্দেশনা ও মতামত সাপেক্ষেই এ ধরনের সিদ্ধান্ত নেয়া যেতে পারে। এজন্যে প্রয়োজন হবে সেমিনার এবং বিতর্ক আলোচনার। শিক্ষক ও ছাত্ররা মিলেমিশে এটা করতে পারেন। সংবাদপত্রেরও এ ব্যাপারে একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। মোট কথা জনমত, আলোচনা ও বিতর্কের সূত্র ধরেই একটা গ্রহণযোগ্য সমাধানের পথ বেরিয়ে আসতে পারে। আমার তো মনে হয় পরীক্ষা পদ্ধতি নতুন করে সাজানোর বিষয়টি এখনও জাতীয় পর্যায়ে ব্যাপকভাবে আলোচিত হয়নি। এ নিয়ে খুব একটা গবেষণাও যে হয়েছে তা নয়। বস্তুতঃ পরীক্ষা পদ্ধতিতে মৌলিক পরিবর্তন আনতে হলে এর ওপর বিস্তর আলোচনা ও গবেষণার দরকার। সে রকম ব্যবস্থা ব্যতিরেকে পরীক্ষা পদ্ধতি ঢেলে সাজানোর পরিণাম শুভ হতে পারে না। আর কর্তৃপক্ষও যে সে ধরনের কোন সিদ্ধান্ত নিয়েছেন আলোচ্য খবর পড়ে অন্ততঃ তা মনে হয় না। মনে হয় পরীক্ষায় ব্যাপকভাবে নকল বা অসদুপায় অবলম্বনের পথ বন্ধ করার জন্যেই কর্তৃপক্ষ কতিপয় ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন। যেগুলো লেখার শুরুতেই উল্লেখ করা হয়েছে।

মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় নকল বা অসদুপায় অবলম্বনের ঘটনা ঘটে চলেছে বহু দিন থেকেই। তবে সাম্প্রতিক বছরগুলোতে পরীক্ষায় অসদুপায় অবলম্বনের ঘটনা বৃদ্ধি পেয়েছে ব্যাপকভাবে। এ ব্যাপারে বহু অভিযোগ উঠেছে। একশ্রেণীর শিক্ষক আর অভিভাবক নকল করার কাজে দুর্ভাগ্যজনকভাবে সহযোগিতা করেন এবং নকল করার সময় বাধা প্রদান বা বহিষ্কার করলে ঘটে অপ্রীতিকর ঘটনা— এরকম অসংখ্য অভিযোগের প্রেক্ষিতে নাকি সম্প্রতি এক তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়। প্রকাশ, এই তদন্ত কমিটির রিপোর্ট ও সুপারিশমালা দেয়ার পর পরই উপরোক্ত নিয়মাবলী আরোপ করা হয়েছে।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে গৃহীত ব্যবস্থার মাধ্যমে পরীক্ষায় নকল বা অসদুপায় বন্ধ করা সম্ভব হবে কিনা। হ্যাঁ, কর্তৃপক্ষের নির্দেশ মোতাবেক কাজ হলে পরীক্ষায় ব্যাপকভাবে নকল করার সুযোগ সংকুচিত হবে এ ব্যাপারে আমরা নিঃসন্দেহ। অস্বীকার করার উপায় নেই যে, ইদানীং এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষায় ব্যাপকভাবে নকল বৃদ্ধি পাওয়ার জন্যে একশ্রেণীর শিক্ষক এবং অভিভাবক অনেকাংশেই দায়ী। পরীক্ষায় নকলের অবাধ সুযোগ প্রদান করে এই শ্রেণীর শিক্ষক বাইরের ছাত্রদের টেনে নেয়ার চেষ্টা করে। নকলের অবাধ সুযোগ থাকায় স্বভাবতঃই পরীক্ষায় কৃতকার্য হওয়ার ব্যাপারে সন্দিগ্ধ ছাত্ররা ঐ সমস্ত শিক্ষকদের কাছে ভিড়ে এবং পরীক্ষার ঠিক আগে নতুন স্কুল বা কলেজে ভর্তি হয়। বলা নিষ্প্রয়োজন যে, এই সমস্ত স্কুল-কলেজের অধিকাংশই মফস্বল এলাকায়। গ্রামের এ রকম অসংখ্য স্কুল-কলেজ আছে যেগুলোর আর্থিক অবস্থা মোটেই ভালো নয়। অনেক স্কুল-কলেজের শিক্ষকদের নিয়মিত বেতনও জুটে না। সাধারণতঃ অর্থনৈতিক দিক দিয়ে অসচ্ছল এ সমস্ত স্কুল-কলেজের শিক্ষকদেরই পরীক্ষায় নকল করার সুযোগ প্রদানে সক্রিয় থাকতে দেখা যায়। কেননা, এতে করে বেশ ভালোসংখ্যক ছাত্রই তাদের জুটে যায় এবং সেই সুবাদে দুটো পয়সাও তাদের আয় হয়। নীতির প্রশ্নে যদিও এটা অত্যন্ত গর্হিত কাজ, কিন্তু মূলতঃ অর্থনৈতিক তাড়নায় অনেক শিক্ষক এ কাজ না করেও পারে না। নতুন নিয়ম বা নির্দেশের ফলে এই সুযোগ হ্রাস পাবে (যদি কঠোরভাবে এই নিয়ম পালিত হয়)। কেননা, এই নিয়ম চালু হওয়ার পর থেকে স্কুল-কলেজের ছাত্ররা ইচ্ছে করলেই যখন তখন ট্রান্সফার সার্টিফিকেট নিয়ে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বদল করতে পারবে না। নতুন নিয়ম অনুসারে এখন থেকে নবম শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীরা প্রতিবছর ৩০শে জুনের পর টিসি নিতে পারবে না। রেজিস্ট্রেশন করার পর এই শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীরা স্কুল থেকে অন্য স্কুলে বদলীও হতে পারবে না। টিসি এনে নতুন কোন ছাত্র-ছাত্রী স্কুলে ভর্তির সুযোগ পাবে না। উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার ক্ষেত্রেও একই নিয়ম প্রযোজ্য হবে। ৩১শে আগস্টের পর কোন ছাত্র-ছাত্রী একাদশ শ্রেণীতে ভর্তি হতে পারবে না। তাছাড়া কোন ছাত্র-ছাত্রী টিসি নিয়ে এক কলেজ থেকে আরেক কলেজে বদলী অথবা ভর্তি হতে পারবে না।

অনেকেরই ধারণা এই নিয়ম প্রবর্তনের পর পরীক্ষায় নকল করার প্রবণতা অনেকাংশে কমে আসবে। কারণ, এই নিয়ম চালু হলে ছাত্র-ছাত্রীরা একবার রেজিস্ট্রেশন করার পর তাদের নিজ নিজ স্কুল অথবা কলেজ থেকে যেতে পারবে না। নকলে অভ্যস্ত ছাত্র-ছাত্রীরা সাধারণতঃ কোন এক স্কুল নয়তো কলেজে ভর্তি হয়। পরে পরীক্ষার সময় যে সমস্ত স্কুল-কলেজে অবাধে নকল করার সুযোগ-সুবিধা পাওয়া যায় ঐ সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে টিসি নিয়ে চলে যায়। এই সুবিধার বদৌলতেই নকলে অভ্যস্ত ছাত্র-ছাত্রীরা যখন তখন টিসি নিয়ে প্রত্যাশিত স্কুল-কলেজে ভর্তি হবার সুযোগ লাভ করছে। আর এই সুযোগই পরীক্ষায় ব্যাপকভাবে নকল বৃদ্ধি পাওয়ার প্রধান কারণ।

সন্দেহ নেই ভর্তি এবং টিসি নিয়ে বদলীর ব্যাপারে নিয়মের কড়াকড়ি থাকলে নকলে অভ্যস্ত ছাত্র-ছাত্রীরা অনেকটাই বিপাকে পড়বে। তারা তাদের ইচ্ছে মত ভর্তি বা বদলী হতে পারবে না। নিয়মের মধ্যে তাদের সব কিছু করতে হবে। আর এই নিয়ম ঠিকভাবে প্রয়োগ করতে পারলে পরীক্ষায় নকল প্রবণতা ধীরে ধীরে কমে আসবে বলে আশা করা যায়। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে এই নিয়ম পুরোপুরিভাবে প্রয়োগ করা কি সম্ভব? হ্যাঁ, এটা সম্ভব হতো যদি সরকারী ও বেসরকারী পর্যায়ের চাকরিজীবীদের বদলীর কোন নিয়ম দেশে প্রচলিত না থাকতো বা আর্থিক ও পারিবারিক কারণে পরিবার-পরিজন স্থানান্তরের প্রশ্ন না উঠতো। আমরা প্রত্যেকেই জানি নানা কারণেই বিভিন্নজনের জায়গা অর্থাৎ কর্মস্থল বদল করতে হয়। নতুন জায়গায় শুরু করতে হয় নতুন জীবন। কর্মস্থল পরিবর্তনের ক্ষেত্রে যেটা সবচেয়ে বড় সমস্যা হিসেবে দেখা দেয় সেটা হচ্ছে ছেলে-মেয়ে ও ভাই-বোনদের লেখা-পড়া অর্থাৎ ভর্তি সমস্যা। ট্রান্সফার সার্টিফিকেট থাকলে সমস্যাটা কাটিয়ে ওঠা যায়। কিন্তু নতুন নিয়ম প্রবর্তনের ফলে এই সমস্যার সমাধান কিছুটা কঠিন হয়ে পড়বে। কেননা, বছরের যে কোন সময় অভিভাবকরা বদলী হলেও তাদের ছেলে-মেয়েরা অন্য স্কুল-কলেজে ভর্তি হতে পারবে না। অবশ্য শিক্ষা বোর্ড কেবলমাত্র অভিভাবকদের বদলীর সময় এই নিয়ম শিথিল করবে বলে কথা রয়েছে। আমরা মনে করি, একমাত্র অভিভাবকদের বদলীর ক্ষেত্রেই তাদের ছেলে-মেয়েদের স্কুল-কলেজে ভর্তির বিষয়টি বিবেচনা করা যেতে পারে। তাছাড়া অন্য কোন কারণেই ছাত্র-ছাত্রীদের অন্য কোন স্কুল বা কলেজে নিয়মের বাইরে ভর্তি বা বদলী করার বিধান রাখা যাবে না। যদি এই নিয়ম কঠোরভাবে মেনে চলা হয় তাহলে আমাদের বিশ্বাস পরীক্ষায় নকল প্রবণতা ক্রমাগত হ্রাস পাবে।

তবে একটি বিষয় স্মরণ রাখা দরকার, পরীক্ষায় নকল প্রবণতা কমানো নয়— নকল বা অসদুপায় সম্পূর্ণভাবে বন্ধ করাই কর্তৃপক্ষের উদ্দেশ্য হওয়া উচিত। এতক্ষণ যে নিয়ম সম্পর্কে আলোচনা করা হলো তা পরীক্ষায় নকল বন্ধের মোক্ষম কোন দাওয়া নয় বা এর সাহায্যে পরীক্ষায় নকল সম্পূর্ণভাবে বন্ধও করা যাবে না। পরীক্ষায় নকল সম্পূর্ণরূপে বন্ধ করতে হলে পরীক্ষা পদ্ধতি নতুন করে ঢেলে সাজানো দরকার। আগেই বলেছি হঠাৎ বা হুট করে কোন সিদ্ধান্ত নিলেই হবে না। বিষয়টি যেমন গুরুত্বপূর্ণ, তেমনি জটিল। এ ব্যাপারে অনেক চিন্তা-ভাবনার অবকাশ রয়েছে। রয়েছে আলোচনা ও বিতর্কের অবকাশ। তাই বিষয়টি জাতীয় পর্যায়ে ব্যাপকভাবে আলোচিত হওয়া বাঞ্ছনীয়। আমরা আশা করবো দশজনের মতামত নিয়েই পরীক্ষা পদ্ধতি ঢেলে সাজানোর বিষয়টি চূড়ান্ত করা হবে।